ধারাবাহিক রচনা

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা প্রবন্ধের ভাষারীতি ও পরবর্তী বাংলা সাহিত্য

অভিজিৎ মাইতি

৩. বিংশ শতাব্দীর আধুনিক কবি-প্রাবন্ধিক এবং অধুনাতন কবি-প্রাবন্ধিকদের গদ্য

রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ যখন চলিত রীতিতে সাহিত্য লিখছেন; প্রমথ চৌধুরী এবং তাঁর গোষ্ঠী যখন সাহিত্যের গদ্যে চলিত রীতি প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন করছেন, সেসময়ে বা অব্যবহিত পরে কাব্যের ক্ষেত্রে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আবির্ভূত হলেন 'কল্লোল', 'কালিকলম' ও 'প্রণতি' গোষ্ঠীর কবিরা। বহ্নিদীপ্ত রবীন্দ্রনাথের 'মোহিনী মায়ায়' না ভুলে তাঁরা চেয়েছিলেন 'রবীন্দ্রেতর' হতে।[২৭] কবিতার ক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচনে তাঁরা বিদ্রোহী মেজাজে এমন একনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন যে, বাংলা সাহিত্য এই 'আধুনিক'দের আবেগতপ্ততায় ভিন্ন পথে হাঁটতে শুরু করেছিল। এইসব কবির মধ্যে বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ অবশ্য কবিতার সঙ্গে সঙ্গে কম-বেশি গদ্যও রচনা করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টান্ত তাঁদের সামনে ছিল, এমনকী বুদ্ধদেব বসু বা সুধীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর নতুন চলিত রীতিকে সমর্থন করেছেন কিন্তু নিজেরা চলিত গদ্য রীতিকে গ্রহণ করে কোনও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হলেন না। হয়তো কবিতার ক্ষেত্রে যেমন তাঁদের দাবি ছিল—কবির মতো কবিতার পাঠককেও হতে হবে শিক্ষিত, পরিশ্রমী—তেমনি পদ্যের ক্ষেত্রেও একই দাবি ছিল। ফলে তাঁদের সুচিন্তিত প্রবন্ধের গদ্য রয়ে গেল সমসাময়িক এক বিরাট আন্দোলন থেকে বহুদূরে। সেক্ষেত্রে তাঁদের গদ্যে মৌখিকতা-নির্ভর চলিত রীতির প্রভাব খুঁজতে যাওয়া বৃথা। তবে বুদ্ধদেব বসুর মতো কেউ কেউ ব্যতিক্রমীও আছেন। তাহলে প্রশ্ন আসে, তাঁরা যে গদ্যে লিখেছেন তা কি সাধু গদ্য রীতিকে অনুসরণ করে? অথবা তাঁদের গদ্য সাধু-চলিতের মিশ্রণে এক ভিন্ন ধরনের গদ্য হয়ে উঠেছে? সে-প্রসঙ্গে আসার আগে স্মর্তব্য, আলোচ্য নবীন কবি-প্রাবন্ধিকদের অনেকে কিন্তু ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, ভ্রমণ-সাহিত্য, রম্যরচনায় চলিত গদ্য ব্যবহার করেছেন। আমরা প্রথমেই কয়েকজন কবি-প্রাবন্ধিকের মূলধারার প্রবন্ধে ব্যবহৃত গদ্য দেখব।

ক. বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮—১৯৭৪)

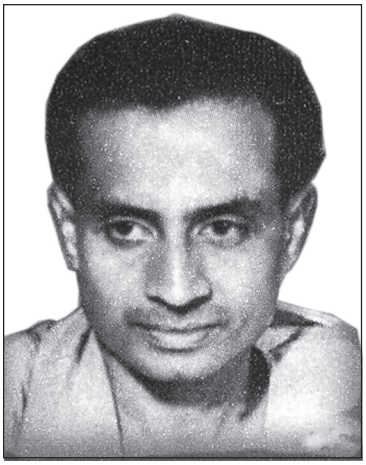
বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসু বাংলা সাহিত্যে সব্যসাচী স্রষ্টা, প্রবন্ধ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য লেখক। সমসাময়িক সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে আলোচনা, রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে আলোচনা, তুলনামূলক সাহিত্য আলোচনা, ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। একজন রসিক পাঠক এবং যোগ্য সমালোচকের ভূমিকায় তিনি সমকালে অন্যান্য সাহিত্যিকদের মধ্যে নিজের পৃথক একটি জায়গা তৈরি করেছিলেন। মননের গভীরতায় এবং স্বচ্ছতায় এমনভাবে তিনি প্রবন্ধ লিখতেন যাতে পাঠক সহজেই একাত্ম হতে পারত। প্রথম থেকেই তিনি চলিত গদ্যে প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর চিন্তাভাবনা প্রকাশের মতোই গদ্যও স্বচ্ছ, পড়াশোনার গভীরতার ছাপ থাকা সত্ত্বেও নির্ভার। গদ্যের কোথাও কঠিন শব্দের ব্যবহার নেই, বাক্য গঠনে অযথা জটিলতা নেই, বুদ্ধির মারপ্যাঁচ নেই। তবে গদ্যের মধ্যে কবির কলমের মেদুরতা মিশে আছে। 'রামায়ণ' প্রবন্ধ থেকে এরকম গদ্যের উদাহরণ উদ্ধৃত করা যায়—

''কৃত্তিবাসের সঙ্গে পরিচয় হলো আরো একটু বড়ো হয়ে। কৃত্তিবাস আমাকে কাঁদালেন, বোধ হয় দুই অর্থেই—কেননা যদিও মনে পড়ে সীতার দুঃখে চোখে জল এসেছে, তবু সে-রকম অসম্ভব ভালো লাগার কোনো স্মৃতি মনে আনতে পারি না। বয়স যখন কৈশোরের কাছাকাছি তখন একখানা মূল বাল্মীকি উপহার পেয়েছিলুম—তার পাতা ওল্টাবার মত উৎসাহ যখন আমার হতে পারতো তার আগেই বইখানা হারিয়ে গেলো। আর তারপর এই এত বছর কাটলো। এর মধ্যে অনেকবার মনে হয়েছে বাল্মীকি পড়ে দেখবো—অন্তত চেখে দেখবো— কিন্তু এই অপব্যয়িত জীবনের অনের সাধু সংকল্পের মত এটিও বিলীন হয়ে গেছে ইচ্ছার মায়ালোকে।''[২৮]

এধরনের সহজ সুন্দর গদ্য আর একটু অন্তরঙ্গতায় সহজ হয়ে এসেছে 'হঠাৎ-আলোর ঝলকানি', 'উত্তরতিরিশ' নামক রম্যরচনাগ্রন্থে। বস্তুত বুদ্ধদেব সমসাময়িক অন্যান্য কবি-প্রাবন্ধিকদের তুলনায় চলিত গদ্য ব্যবহার করেছেন অনেক সহজ স্বাভাবিকতায়।

খ. জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯—১৯৫৪)

জীবনানন্দ দাশ

মনন, যুক্তির নিপুণ প্রয়োগ, নিরাবেগ প্রকাশভঙ্গিমা, ধীর-সংহত উপস্থাপনা, শব্দপ্রয়োগের নতুনত্ব এবং সর্বোপরি আত্মসমাহিত মগ্নমুখিনতায় 'চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা' দিয়ে বাংলা প্রবন্ধ লিখেছেন এবং স্বতন্ত্র গদ্যশৈলী নির্মাণ করেছেন

জীবনানন্দ দাশ। যদিও তাঁর গদ্যের মূল কাঠামো চলিত কিন্তু তাতে সাধু গদ্যের classic style-টিই প্রধান। যেমন তিনি কবির হৃদয় থেকে কবিতার সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এরকম গদ্যে—

''কিন্তু যাঁরা বলেন সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে—পৃথিবীর কিংবা স্বকীয় দেশের বিগত বা বর্তমান কাব্যবেষ্টনীর ভিতর চমৎকাররূপে দীক্ষিত হয়ে নিয়ে, কবিতা রচনা করতে হবে তাঁদের এ দাবির সম্পূর্ণ মর্ম আমি অন্তত উপলব্ধি করতে পারলাম না। কারণ আমাকে অনুভব করতে হয়েছে যে, খণ্ড-বিখণ্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক এক সময় যেন থেমে যায়, —একটি পৃথিবীর-অন্ধকার-ও-স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন যেন জ্বলে ওঠে হৃদয়, এবং ধীরে ধীরে কবিতা-জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়। এই চমৎকার অভিজ্ঞতা যে সময় আমাদের হৃদয়কে ছেড়ে যায়, যে সব মুহূর্তে কবিতার জন্ম হয় না, পদ্য রচিত হয়...।''[২৯]

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

এই গদ্যের মূল কাঠামো চলিত রীতির কিন্তু মৌখিক ভাষার কাছাকাছি নয় এই গদ্য। বুদ্ধির, মননের প্রখরতায় ভাষারীতি বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে। এই পর্বের কবিরা যেমন কবিতার মধ্যে গদ্যের গুণ প্রবেশ করিয়েছেন তেমনি এই গদ্যে যেন কবিতার গুণ প্রবেশ করিয়েছেন।

গ. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১—১৯৬০)

রবীন্দ্র-উত্তর আধুনিক কবিদের অন্যতম সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর প্রবন্ধগুলি দুটি গ্রন্থে সংকলিত—'স্বগত' (১৯৩৮) এবং 'কুলায় ও কালপুরুষ' (১৯৫৭)। প্রচুর তৎসম শব্দ, অপ্রচলিত তৎসম শব্দ দিয়ে গদ্যের ভাষা নির্মাণ করেছেন তিনি। আসলে ভাষার মধ্যে ধ্রুপদী গাম্ভীর্য এবং সংহত ভঙ্গি সৃষ্টিতে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। যদিও কাব্যিক মেজাজ গদ্যের অবয়বে ক্রিয়াশীল থেকেছে। আবার একথাও ঠিক যে, দেশি-বিদেশি শব্দও তৎসম শব্দের পাশে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেছেন তিনি। বাহুল্যকে কোথাও প্রশ্রয় দেননি। যেভাবে তিনি সহজ কথাকে ঘুরিয়ে বলেন তাতে গদ্যের ভাষায় বুদ্ধিবৃত্তির প্রণোদনা জড়ানো থাকে যথেষ্ট এবং তা কবির অহংকারে দৃপ্ত। তাঁর স্বীকারোক্তিতে সে-অহং-এর প্রতিধ্বনি শোনা যায় : ''কিন্তু জোরালো কথাকে ঘোরালো করে তোলার অভ্যাস পঁচিশ বছরের আত্মধিক্কারেও কাটেনি; এবং তীর্যক্ রীতির বিপদ এই যে তার ভঙ্গুর অঙ্গবিন্যাসে যোগ-বিয়োগের ভার সয় না।''[৩০] এই 'আত্মধিক্কার' আসলে ইতিবাচক অহংকার। তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'কাব্যের মুক্তি' থেকে উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে—

''তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে শুধু ব্রাউনিং-ই অস্পষ্টভাবে মেনেছিলেন যে নটরাজের নৃত্যের তাল সবসময়ে শ্রবণসুলভ নয়, সৃষ্টির সুরে আসন্ন-প্রসবার আর্তনাদও মাঝে মাঝে শোনা যায়; একা তিনিই জেনেছিলেন যে সিদ্ধ-সমৃদ্ধদের অসহযোগে জীবনের মিছিলে হয়তো আড়ম্বরের অভাব ঘটে, কিন্তু নিঃস্ব-লাঞ্ছিতদের অপাংক্তেয় ভাবলে, সে শোভাযাত্রার সঙ্গে শবযাত্রার কোনো প্রভেদ থাকে না।''[৩১]

উপরিউক্ত উদাহরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে এই সময়ের কবি-প্রাবন্ধিকদের গদ্যের মূল কাঠামো চলিত ভাষার। মূল কাঠামো বলতে সর্বনাম বা ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপের ব্যবহার। কিন্তু তারই সঙ্গে তৎসম শব্দ এবং সুধীন্দ্রনাথের মতো অবোধ্য তৎসম শব্দ যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়েছে। আবার তৎসম শব্দের পাশেই নিতান্ত মুখের ভাষার শব্দ, এমনকী মুখের উচ্চারণে বিকৃত শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। তাই উনিশ শতকের সাধু গদ্য রীতির পুনর্নির্মাণ বা পুনঃ-অনুসরণ নয় এই ভাষা। উনিশ শতকে অবোধ্য তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হত লেখকের ব্যবহৃত শব্দভাণ্ডারের অপ্রতুলতার কারণে। আলোচ্য নবীন লেখকরা অবোধ্য তৎসম শব্দ ব্যবহার করতেন ইচ্ছাকৃত পরিশ্রমে। গদ্যে যে-ধ্রুপদীয়ানা তাও আসলে প্রকাশভঙ্গির সংহতি এবং অবশ্যই যার মূলে আছে বুদ্ধদেব বসু কথিত 'বুদ্ধিঘটিত ঘনতা'।[৩২] অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসু যে সহজ সরল চলিত গদ্যে সব ধরনের প্রবন্ধ লিখেছেন তা কিন্তু তাঁর সমসময়ে বা পরবর্তী কালের অন্য কোনও প্রাবন্ধিক তাঁর মতো করে সর্বক্ষেত্রে একচেটিয়াভাবে গ্রহণ করেননি।

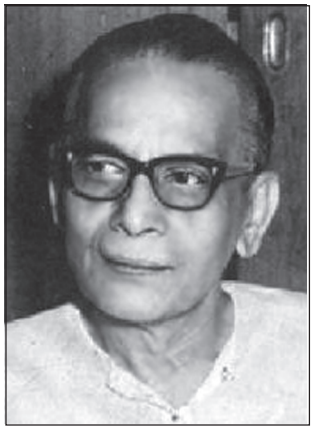

সুবোধ ঘোষ

তবে তিরিশের দশকে আবির্ভূত কবি-প্রাবন্ধিকদের সৃষ্ট গদ্য কবির কলমের গদ্য। এইধরনের গদ্যের একটি ধারা বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত হয়ে গেল এবং সেই ধারায় এসে দাঁড়ালেন সুবোধ ঘোষ, শঙ্খ ঘোষের মতো কবিরা। অবশ্যই প্রত্যেকে নিজেদের স্বতন্ত্র গদ্যশৈলী নির্মাণ করেছিলেন সফলভাবে এবং তা-ই স্বাভাবিক। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের মধ্যেও ব্যক্তিগত অনুভূতি মিশিয়েছেন এঁরা। খুব স্বাভাবিক, কবি বলেই প্রবন্ধে ব্যক্তিগত অভিরুচিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। পাঠকও সমালোচনায়, শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় সেগুলিকে গ্রহণ করেছেন। এজন্যই তো সেই রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে এরকম প্রবন্ধ অনেকসময় সাহিত্যের সমালোচনা হয়েও ভিন্ন সাহিত্য-সংরচন করেছে—হয়ে উঠেছে creation of creations। উদাহরণ হিসাবে একালের কবি-প্রাবন্ধিক শঙ্খ ঘোষের (১৯৫১—) প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করা যায়,

''এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যায়, যখন সমস্তের সঙ্গে আমি মিলি। সংসারের রূঢ় অপমান কুমুকে বিঁধছিল যখন, তখন সে ভুল করে তার চারপাশে তৈরি করছিল আরো একটা আবরণ, যে-আবরণ নিজের সম্বন্ধে নিজের চৈতন্যকে কমিয়ে দেয়। উলটো করে বরং তারই খুলে দেবার কথা ছিল এই প্রচ্ছদ, কেননা যতই আমরা নিজের দিকে আসি, আসি ভালবাসার দিকে, ততই আমি ছড়িয়ে পড়ি ছোটো এক আত্মগণ্ডীর বাইরে। পুরুষ যখন নারী অথবা নারী যখন পুরুষকে ভাবতে পারে এই মুক্তি, নিজের কাছ থেকে নিজের মুক্তি, তখনই তার ভালবাসা। রবীন্দ্রনাথের পূজার গান যেমন, তাঁর 'প্রেম'-এর গানও তেমনি এই মুক্তির গান।''[৩৩]

এই যে গদ্য তা চলিত গদ্য, তবে কবির কলমের গদ্য, সৃষ্ট-সাহিত্যের থেকে আর এক সৃষ্টির গদ্য।

৪. সাধু গদ্য রীতি ও কথাসাহিত্য

এখন প্রশ্ন, উনিশ শতকের শেষ পাদে, সাহিত্যে যে-সাধু গদ্য রীতি বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দের হাতে অলৌকিকপ্রায় ঐশ্বর্য অর্জন করেছিল তার কোনও অবশেষ কি বিংশ শতাব্দীতে ছিল? বিশেষত

সর্বনাম, ক্রিয়াপদকে পূর্ণরূপে রেখে আর বাকি অংশে বেশিরভাগ তদ্ভব-দেশি-বিদেশি শব্দ ব্যবহার করে সাধু গদ্যের যে-তরল রূপ প্রচলিত হল, তার বাইরে উনিশ শতকীয় classic সাধু গদ্যের চর্চা কি আর হচ্ছিল? আমরা 'তরল সাধু গদ্য' শব্দটি তুচ্ছার্থে ব্যবহার করছি না। এরকম সাধু গদ্যতেই বিখ্যাত উপন্যাস-ছোটগল্প-প্রবন্ধ ইত্যাদি রচিত হয়েছে এবং প্রধান গদ্যলেখকদের শৈলী এই গদ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা পরে সেই আলোচনায় আসব। এখানে শুধু বলতে চাই 'তরল সাধু গদ্য' বলতে আমরা উনিশ শতকের classic সাধু গদ্যের তুলনায় তদ্ভব-দেশি-বিদেশি-কৃতঋণ শব্দনির্ভর এবং সন্ধি-সমাসের ভারে অযথা কণ্টকাকীর্ণ না হওয়া সহজ সাধু গদ্যের কথাই বলছি।

তবে গদ্যের মধ্যে উনিশ শতকের মতো ধ্রুপদী চাল নির্মাণের সচেতন চেষ্টা করেছেন কয়েকজন মাত্র সাহিত্যিক। যেমন সুবোধ ঘোষ (১৯০৯—১৯৮০) রচনা করলেন 'ভারত প্রেমকথা' (১৩৬২ বঙ্গাব্দ)। এ-গ্রন্থের 'অতিরথ ও পিঙ্গলা' আখ্যানের গদ্যে classic style-এর চমৎকার নিদর্শন,

''বিলোলহারাবলীললিত... বক্ষ, হরিচন্দনবিরচিত চিত্রকে চর্চিত চিবুক, কুন্দাভ স্মিতচন্দ্রিকার মত হাসি, সিন্ধুজলবিধৌত রক্তপ্রবালের মত অধরদ্যুতি, স্তোকোৎফুল্ল কোকনদোপম সুকোমল পদতল এবং কর্পূরপরাগে সুবাসিত গ্রীবা—রূপজীবা পিঙ্গলা তার কস্তূরিকাবাসিত চীনাম্বর আন্দোলিত করে, স্তবকিত চিকুরের মৌক্তকজালিকা চঞ্চলিতা করে, আর মণিময় রত্নাভরণ শিঞ্জিত করে পুষ্পবলয়ে চিহ্নিত নৃত্যস্থলীর মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।''[৩৪]

এই গদ্য বিনা ব্যাখ্যায় আমাদের যুক্তিকে সমর্থন করে। ধ্রুপদী সাধু গদ্যের আর-এক নিদর্শন পাওয়া যায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৯—১৯৭০) ঐতিহাসিক গল্প ও উপন্যাসগুলিতে। 'কুমার-সম্ভবের কবি' (১৩৭০ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসের শুরু হচ্ছে এভাবে :

''একালের কথা নয়, কালিদাসের কালের কাহিনী।

''জনাকীর্ণ নগরীর রাজপথ দিয়া এক হরিচন্দন বিচিত্র হস্তী রাজকীয় মন্থরতায় হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। স্কন্ধে অঙ্কুশধারী মাহুত; পৃষ্ঠের মহার্ঘ কারুখচিত আসনের উপর বসিয়া ঘোষক পটহ বাজাইতেছে। ঘোষকের দুই হস্তে দুইটি মুষলাকৃতি পটহ-দণ্ড, দ্রুতচ্ছন্দে পটহচর্মের উপর আঘাত বৃষ্টি করিতেছে।

''চারিদিকে নাগরিকের জনতা। সকলেই ঘোষকের জ্ঞাপনী শুনিবার জন্য উৎসুক ঊর্ধ্বমুখে হস্তীর সহগমন করিতেছে। পথপার্শ্বে দ্বিতল ত্রিতল হর্ম্যগুলির গবাক্ষে অলিন্দে কুতূহলী নাগরিকাদের মুখ লোভনীয় পশ্চাৎপটের সৃষ্টি করিয়াছে। জনতার কোলাহল ও পটহের রোল মিশিয়া বিচিত্র ধ্বনিকল্লোল উত্থিত হইতেছে।''[৩৫]

কিন্তু এই ভাষা মূল সাহিত্যের মধ্যে আর সচল নেই। ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক কাহিনি বর্ণনাতে, ছায়াচ্ছন্ন অতীতের যে-জীবনটা আমাদের কল্পনায় আর গল্পকথায় ফিরে আসে সেই জীবনকে

পুনর্নির্মিত করতে এই ভাষা সৃষ্টি করছেন সাহিত্যিকরা। সমকালীন জীবন যে-সাহিত্যে ধরা দিচ্ছে, সেখানে এই ভাষা আর ব্যবহৃত হচ্ছে না। তাই এই ধ্রুপদী সাধু গদ্য হয়ে উঠেছে এক বিশেষ ক্ষেত্রের 'রেজিস্টার'।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তাহলে এখন প্রশ্ন আসে রেজিস্টার-বদ্ধ সাধু ভাষা ছাড়া কোন সাধু ভাষায় বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য রচিত হচ্ছে? এখানেই আমরা পূর্বকথিত 'তরল সাধু গদ্যে'র প্রসঙ্গটি পুনরায় স্মরণ করব। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই উপন্যাস, ছোটগল্প কখনও তরল সাধু গদ্যে, কখনও সংলাপ চলিত গদ্যে ও বাকি অংশ সাধু গদ্যে রচিত হয়েছে। চলিত গদ্যে যে কিছু কিছু কথাসাহিত্য লেখা হচ্ছে না তা নয়। তবে তা সামান্যই। বিংশ শতাব্দীতে শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর বা মানিক—সব প্রধান কথাকারই সাধু গদ্যে লিখেছেন। এঁদের মধ্যে একজন মাত্র বিখ্যাত লেখকের রচনাংশ উদ্ধৃত করে অতিসংক্ষিপ্ত এবং অবশ্যই সীমাবদ্ধ এক টুকরো পরিচয় নেব এইধরনের গদ্যের। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালি' (১৯২৯)-র কিছু অংশ—

''শুধু ইন্দির ঠাকরুণ এখনো বাঁচিয়া আছে। ১২৪০ সালের সে ছিপ্‌ছিপে চেহারার হাস্যমুখী তরুণী নহে, পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধা, গাল তোব্‌ড়াইয়া গিয়াছে, মাজা ঈষৎ ভাঙ্গিয়া শরীর সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, দূরের জিনিস আগের মতো চোখে ঠাহর হয় না, হাত তুলিয়া যেন রৌদ্রের ঝাঁঝ হইতে বাঁচাইবার ভঙ্গিতে চোখ ঢাকিয়া বলে, কে আসে? নবীন? বেহারী? না, ও। তুমি রাজু...''[৩৬]

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কথাসাহিত্যে প্রধান হয়ে উঠেছে চলিত গদ্যের ব্যবহার। আসলে কথাসাহিত্যে এবং নাটকের সংলাপে যেহেতু চলিত গদ্য ব্যবহৃত হত এবং বিংশ শতাব্দীর প্রধান কথাকাররা সরল সাধু গদ্যে লিখছেন, তাই পরবর্তী কালের কথাকারদের কাছে বা নাট্যকারদের কাছে চলিত গদ্যকে বা দৈনন্দিন জীবনের মুখের ভাষাকে গ্রহণ করা অনেক সহজ ছিল। উপরন্তু উপন্যাস-ছোটগল্পে নিম্নবর্ণের মানুষদের তুলে আনার সংকল্পে নিম্নবর্গের ভাষাও সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। আঞ্চলিক ভাষায় কথাসাহিত্য বা নাটক রচিত হয়েছে।

৫. সাধু গদ্য রীতি ও প্রবন্ধ সাহিত্য

অন্যদিকে প্রবন্ধের ক্ষেত্রে চলিত গদ্য গ্রহণ করা অতটা সহজ ছিল না। কারণ প্রমথ চৌধুরীর আন্দোলন সত্ত্বেও তাঁর লেখায় যে-গদ্য নির্মিত হয়েছে তা আসলে দৈনন্দিন জীবনের ভাষা নয়। অন্যদিকে সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে বা অমিয় চক্রবর্তীদের হাতে যে-গদ্য নির্মিত হয়েছে তা কিন্তু প্রবন্ধের ভাষাকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করেছে। উপরন্তু অন্যান্য সাহিত্যিকরা ব্যক্তিগত প্রবন্ধে বা রম্যরচনায় যে-গদ্য লিখছেন তা হালকা চালের, দৈনন্দিন জীবনের ভাষাকে অঙ্গীকার করেই। কিন্তু তার ফলেই তৈরি হয়েছে একটি স্পষ্ট বিভাজন। অর্থাৎ সর্বত্র মুখের ভাষা গ্রহণীয় নয়। সিরিয়াস বিষয়ের ভাষা হবে সাধু গদ্য রীতি-আশ্রয়ী, রম্যরচনার ভাষা হবে হালকা চালের চলিত

রাজশেখর বসু

রীতি-আশ্রয়ী। অনেক লেখকই তাই মূল ধারার প্রবন্ধে একরকম ভাষা ব্যবহার করছেন, আবার রম্যরচনায়, ভ্রমণসাহিত্যে বা চিঠিপত্রের মতো আত্মগত রচনায় চলিত গদ্য ব্যবহার করছেন। প্রমথ চৌধুরীর পরেও সাধু ও চলিত রীতির মধ্যে বিতর্ক যে প্রশমিত হয়নি তার পরিচয় পাওয়া যায় রাজশেখর বসুর 'সাধু ও চলিত ভাষা' (১৩৪০ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক পুরনো বিতর্কের সমাধানই খুঁজেছেন। সাধুভাষা সাহিত্যে সহজে গৃহীত হওয়ার কারণ হিসাবে বলেছেন, বাংলাদেশের শিশুরা প্রথম থেকেই সাধু ভাষায় শিক্ষা লাভ করে বলেই এই রীতি তাদের বেশি আয়ত্ত হয়ে যায়। বহু প্রচলিত সংবাদপত্রে বা মাসিক পত্রেও সাধু ভাষা পড়তেই পাঠক অভ্যস্ত।[৩৭] চলিত ভাষায় যেটুকু সাহিত্য রচিত হয় তাতেও অনুসরণ-উপযোগী কোনও আদর্শ নেই বলেই লেখকেরাও এই ভাষাকে 'দূর থেকে নমস্কার করেন'।[৩৮] সাধু ভাষা আর চলিত ভাষার যোগ্য আদান-প্রদানে যদি আদর্শ চলিত ভাষা নির্মিত হতে পারে, তাহলে সমস্ত বিদ্যাচর্চার বিষয়ই সেরকম আদর্শ লৈখিক ভাষায় লেখা যেতে পারে বলে মনে করেছেন তিনি। লক্ষণীয়, প্রমথ চৌধুরীর মতোই এখানেও রাজশেখর বসু উল্লেখই করলেন না যে স্বামী বিবেকানন্দ মান্য চলিত গদ্যের আদর্শ তৈরি করে গেছেন। বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনার তিন দশকেরও বেশি সময় অতিক্রম করেও সাহিত্যিকরা, বিবেকানন্দের চলিত গদ্যের ঋণ স্বীকার না করেছেন সাহিত্যরচনায়, না করেছেন তাত্ত্বিক আলোচনায়। অবশ্য ঋণ স্বীকার তো দূরের কথা, স্বামী বিবেকানন্দের চলিত গদ্য সংক্রান্ত তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রধান লেখকরা কতটা সচেতন ছিলেন সে-বিষয়েই মনে প্রশ্ন জাগে। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা রম্যরচনার ধারায় বাংলা সাহিত্য চলিত গদ্যের একটি ভিন্ন আদর্শ নির্মাণ করে চলেছিল সাধু গদ্যের পাশাপাশি। সেই আলোচনায় প্রবেশের আগে স্মরণ করব, রাজশেখর বসুর প্রদর্শিত, চলিত-নির্ভর 'লৈখিক ভাষা' প্রচলিত হওয়ার একটি উপায়ের প্রসঙ্গ—বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক উক্ত ভাষায় রচিত হওয়া। কিন্তু মজা হল, বিংশ শতাব্দীর অর্ধদশকের পরেও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নানা সাহিত্য সমালোচনা করছেন বা গবেষণামূলক কাজ করছেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাধু ভাষায়; এমনকী ১৯৬৫ সালের পর থেকে সংবাদপত্রে চলিত ভাষা পূর্ণভাবে গৃহীত হওয়ার পরেও। মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮—১৯৫২), শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯২—১৯৭০), শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৯১১—১৯৬৪), বিমানবিহারী মজুমদার (১৮৯৯—১৯৬৯), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০—১৯৭৭), নীহাররঞ্জন রায় (১৯০৩—১৯৮১), প্রমথনাথ বিশী (১৯০১—১৯৮৫), সুকুমার সেন (১৯০০—১৯৯২) প্রমুখ পণ্ডিত ও বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব প্রধানত সাধু গদ্যেই লিখেছেন। আরও মজার হল, এঁরা যে অনেকেই স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন সেকথা স্বীকার করেছেন বা তাঁর দেশপ্রেম, ধর্মভাবনা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু তাঁর গদ্য ভাষা নিয়ে আলোচনা বা চর্চা করেননি। আবার এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বা এই তালিকার বাইরে অনেক

খ্যাতনামা প্রাবন্ধিক আছেন যাঁরা স্বামীজীর চলিত গদ্যের প্রশংসা করলেও নিজেরা লেখার সময় সাধু গদ্যের সর্বনাম, ক্রিয়াপদটুকু বাদ দিয়ে লিখতে পারেননি। আগেই বলেছি, উল্লিখিত সমস্ত প্রাবন্ধিকরা যে খুব কঠিন তৎসম শব্দ-সমাস- সন্ধি পরিকীর্ণ সাধু গদ্যে লিখেছেন তা নয়। বরং সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ বাদ দিলেই তাঁদের গদ্যকে চলিত গদ্য বলা যায়। একজন প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধের কিছুটা অংশ গদ্যের নমুনা হিসাবে সংগ্রহ করা যেতে পারে—

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

'' 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র রসাস্বাদন বা রসনিবেদন এই দিকটার আলোচনাই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক কেন, আশা করি সে কৈফিয়ৎ আর দিতে হইবে না। তথাপি এই প্রসঙ্গে আরও দুই একটি কথা বলিব। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র কবিত্ব, ঘটনা, কাহিনি এবং ভাবৈশ্বর্য্য যতই উচ্চাঙ্গের হউক, তাহাতেই মধুসূদনের কবিশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা যাইবে না, তাঁহার প্রতিভার অনন্যসাধারণ মহিমা স্বীকৃত হইবে না।''[৩৯]

অবশ্যই এইসব গদ্যলেখক নিজ নিজ গদ্যশৈলীর স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। আমরা কেবল একটি সময়ের, একটি ধারার প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যগুলি অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি মাত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উল্লিখিত জ্ঞানানুরাগীদের পরবর্তী প্রজন্মের অনেক সাহিত্য-সমালোচক প্রবন্ধে কিন্তু চলিত রীতিকেই একমাত্র গ্রহণ করেছেন। যেমন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৬—২০০৩), শিশিরকুমার দাশ (১৯৩৬—২০০৩) প্রমুখ। আসলে পরবর্তী প্রজন্মের এইসময় থেকে সাহিত্য, সমালোচনায় সর্বক্ষেত্রে চলিত রীতির ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে।

৬. সিরিয়াস প্রবন্ধের দুজন ব্যতিক্রমী গদ্যলেখক

আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাই দুজন ব্যতিক্রমী প্রাবন্ধিকের কথা—অন্নদাশঙ্কর রায় ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এঁদের নাম আলাদা করে উল্লেখ করার বিশেষ কারণ আছে। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্র'-দ্বারা উক্ত দুই প্রাবন্ধিকই গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। দুজনেই, জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত প্রবন্ধ চলিত গদ্যে লিখেছেন। অন্নদাশঙ্কর অন্যান্য সাহিত্যও চলিত গদ্যে রচনা করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ একেবারে দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সমস্ত প্রবন্ধ চলিত গদ্যে লিখেছিলেন। তিনি আসলে তো বৈজ্ঞানিক। ফলে ওই দু-একটি ব্যতিক্রম ধর্তব্যের মধ্যে আনা উচিত নয়। বরং সত্যেন্দ্রনাথ চলিত গদ্য নিয়ে যা করতে পেরেছেন, স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা প্রবলভাবে অভ্যর্থিত জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর প্রবন্ধে তা করতে পারেননি। স্বামীজীর সর্ববিদ্যায় চলিত গদ্য ব্যবহারের অভিপ্রায়ের বাস্তব রূপ কেমন হতে পারে, বিজ্ঞান-লেখার ক্ষেত্রে তার উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রবন্ধ। সমকালীন গদ্যের রীতি নির্বাচনে লেখকদের দ্বিধা এবং প্রবণতাকে মাথায় রাখলে আলোচ্য দুই প্রাবন্ধিক আমাদের আশ্চর্য করবেন।

ক. অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২)

অন্নদাশঙ্কর রায় 'সবুজ পত্র' থেকে প্রবন্ধ রচনা করতে শুরু করেন এবং একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আমরণ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। মনস্বী লেখক তিনি,

বিংশ শতাব্দীতে রচিত বাংলা গদ্যের তিনি যেন নিজেই একটি স্বতন্ত্র ধারা। তরুণ বয়সে 'তারুণ্য' যখন লিখেছিলেন তখন যেমন ছোট ছোট বাক্যে, নিতান্তই পরিচিত শব্দ ব্যবহার করে, ক্রিয়াপদের কম ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গদ্যকে গড়ে তুলেছিলেন, পরিণত বয়সে সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকেই আরও শাণিত, পরিণত করেছেন। যেমন ১৯৭৬-এ রচিত 'শিক্ষার সঙ্কট' প্রবন্ধের ভাষা—

''ব্যতিক্রম হিসাবে ছিল আরো একপ্রকার শিক্ষা। সেটা হতো বড়োলোকদের বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কল্যাণে। পাঠশালায় বা টোলে বা পাদ্রীদের স্কুল কলেজে তার জন্যে ব্যবস্থা ছিল না। থাকলেও গৌণভাবে। সেটা হলো কাব্যপাঠ বা ক্লাসিক চর্চা। সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক ভাষায়। রাজসভার সভাসদ বা অভিজাত শ্রেণীর দু-চারজন ব্যক্তি বহুব্যয়ে কালিদাস বা ভবভূতি, ভার্জিল বা অ্যারিস্টটল পড়তেন। রাজসভায় বা জমিদারের বৈঠকখানায় তা নিয়ে আলাপ আলোচনাও হতো।''[৪০]

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

খ. সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪)

সুহৃদ হারিতকৃষ্ণ দেবের সাহচর্যে 'সবুজ পত্র' গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁদের বৈঠকে যাতায়াত করতেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। সাহিত্য-অনুরাগী এই মানুষটি প্রমথ চৌধুরীর চলিত রীতির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে চলিত রীতিতে বিজ্ঞানের প্রবন্ধগুলিও লিখতে শুরু করেন। আজীবন এই রীতিতেই তিনি লিখেছেন। বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিকদের জীবনী, স্মৃতিকথা, শিক্ষা, বিজ্ঞানের বিষয়ের অনুবাদ প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছেন।[৪১] তাঁর গদ্য থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। যেমন, বিজ্ঞানের আবিষ্কারে মানবসভ্যতার অগ্রগতিকে তিনি বর্ণনা করেছেন এভাবে—

''সাধনাতেই সিদ্ধি। বহুযুগের চেষ্টায় সে তার কল্পনাকে বাস্তব করার পথে কিছুদূর এগিয়েছে। তার কার্যতৎপরতার ফলে প্রকৃতিরও ঘটেছে স্থায়ী পরিবর্তন। তারি উদ্ভাবনী শক্তির কল্যাণে এই জগতে এসেছে অনেক নতুন বস্তু, নতুন প্রাণী। নতুন আলোর ছটায় অদৃশ্য পরমাণু-জগৎ পর্যন্ত প্রকাশিত হচ্ছে। বহু বাধা সে অতিক্রম করেছে, অদম্য ইচ্ছার চাপে প্রতিকূল অবস্থাকে করে তুলেছে তার অনুকূল।''[৪২]

এই ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, তেমনি 'অল্পের মধ্যে অনেক'। বিজ্ঞানের বিষয়কেও সাহিত্যের গুণে রাঙিয়েছে এ-গদ্য। বাঙালির বিজ্ঞানচর্চা এই ভাষায় ঐশ্বর্য পেয়েছে, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে মাইলস্টোন হয়ে উঠেছে। শুধু বিজ্ঞানের অগ্রগতির বর্ণনায় নয়, বিজ্ঞানের আঁককাটা প্রমাণ-ভূমির বস্তুনিষ্ঠতার বর্ণনাতেও লেখক সমান পটুহস্ত—

''এখানেও বৈজ্ঞানিক সমাধানের রীতি ঐ একই নিয়মের অধীন। যেমন, প্রথমে বেলুন-ভরার জন্য হাইড্রোজেন কিংবা জ্বালানী গ্যাসের কথা। এই দুই এর ব্যবহারে অগ্নিকাণ্ড ঘটে বেলুন ফেঁসে গিয়ে সর্বনাশ ঘটবার ভয় প্রচণ্ড। তাই এখন আমরা অদাহ্য গ্যাসের দ্বারাই বেলুন ভরছি। এই উন্নতি সম্ভব হয়েছে দুটি কারণে।

প্রথম সূর্যের আবহমণ্ডলে কোন্ জিনিস আছে বা কোন্ জিনিস নেই, তা আজ নির্ণয় করা গেছে (ফলে হিলিয়ামের আবিষ্কার)। দ্বিতীয় কারণ র‍্যালে (Rayleigh) রামসে (Ramsay) প্রমুখ বিজ্ঞানীদের গবেষণা।"[৪৩] *ক্রমশ*

তথ্যসূত্র

২৭। *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র* অন্তর্গত 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি : কলকাতা, ২০১৫), খণ্ড ৪, পৃঃ ২৩২, ২৩৭ [এরপর, *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ-সমগ্র*]

২৮। তদেব অন্তর্গত 'রামায়ণ', পৃঃ ১৩৯-১৪০

২৯। জীবনানন্দ দাশ, *কবিতার কথা* (সিগনেট প্রেস : কলকাতা, ১৪১৩), পৃঃ ৭-৮

৩০। সম্পাদক : অমিয় দেব, *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ* (দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, ২০১০), পৃঃ ১৯৩

৩১। তদেব, পৃঃ ১৭

৩২। *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র*, পৃঃ ২৩৯

৩৩। শঙ্খ ঘোষ, *এ আমির আবরণ*, অন্তর্গত 'এ আমির আবরণ' (প্যাপিরাস : কলকাতা, ২০০৮), পৃঃ ৭০

৩৪। সুবোধ ঘোষ, *ভারত প্রেমকথা*, *অন্তর্গত* 'অতিরথ ও পিঙ্গলা' (আনন্দ পাবলিশার্স : কলকাতা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ৫৭

৩৫। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, *ঐতিহাসিক কাহিনি সমগ্র*, *অন্তর্গত* 'কুমারসম্ভবের কবি' (আনন্দ পাবলিশার্স : কলকাতা, ১৯৯৭), পৃঃ ৬৩৫

৩৬। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পথের পাঁচালী*, (মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স : কলকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ৫

৩৭। রাজশেখর বসু, *লঘুগুরু প্রবন্ধাবলী*, *অন্তর্গত* 'সাধু ও চলিত ভাষা' (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস: কলকাতা, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ৮০

৩৮। তদেব, পৃঃ ৮০

৩৯। কবি শ্রীমধুসূদন, *মোহিতলাল মজুমদার* (বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রাঃ লিঃ : কলকাতা, ২০০৪), পৃঃ ৪১

৪০। সম্পাদক : শ্রীধীমান দাশগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, *প্রবন্ধ সমগ্র* অন্তর্গত 'শিক্ষার সঙ্কট' (মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স : কলকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ), খণ্ড ২, পৃঃ ১৩৭

৪১। *সত্যেন্দ্রনাথ বসুর রচনা সঙ্কলন*, অন্তর্গত 'প্রাক্‌কথন' অংশ, (বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ : কলকাতা, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ), পৃঃ প্রাক্‌কথন-ক

৪২। *সত্যেন্দ্রনাথ বসুর রচনা সঙ্কলন*, অন্তর্গত 'শক্তির সন্ধানে মানুষ' অংশ, (বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ : কলকাতা, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ২২

৪৩। *সত্যেন্দ্রনাথ বসুর রচনা সঙ্কলন*, অন্তর্গত 'গণিতক্ষেত্রে উদ্ভাবনের মনস্তাত্ত্বিক বিচার' (বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ : কলকাতা, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ৩১৭